স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভারা

বেগম রোকেয়া (৩)

আকিমুন রহমান

রোকেয়ার মধ্যে স্ববিরোধ বিস্তর। নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি নিয়তই দুলেছেন দ্বিধা ও অস্পষ্টতার দোলায়। যদিও এক আধবার মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে ছেড়ে দেয়ার মতো উত্তেজক কথা তিনি বলে উঠেছেন, কিন্তু তার ভেতরেও অনড় হয়েছিলো পুরুষতান্ত্রিক ওই বিশ্বাস যে নারীর শিক্ষা প্রয়োজন শুধু প্রভুর যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে ওঠার জন্যে। ... ... তাই নারীশিক্ষার জন্যে রোকেয়ার সকল উদ্যম, শ্রম, 'জ্বালাময়ী ভাষণ'কে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিরা যতোই মহিমান্বিত করে তুলুক না কেনো, ওই সকল বাঙালি নারীর প্রকৃত মুক্তির পথে কোনই ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি।

পূর্ববর্তী পর্বের পর :

রোকেয়াকে পুরুষতন্ত্র স্তব করে শিক্ষাব্রতী হিশেবে। রোকেয়া তাঁর বৈধব্যের কাল বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে আর বিদ্যার্থী সংগ্রহের কাজে কাটিয়েছেন এ কথা ঠিক। তবে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে রোকেয়া নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসেননি। রোকেয়া এ-পথে এসেছেন কারণ, তাঁর প্রভু তাঁর বৈধব্যের কাল এভাবেই কাটাবার ব্যবস্থা করে গেছে, তাই। যদি তাঁর প্রভু তাঁর জন্য এমন একটা ছক তৈরী করে না দিয়ে যেত, তাহলে তাঁর জীবন হত ভিন্ন, অন্য কোন ছকে কাটতো তাঁর জীবন। নারী শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্রতী হওয়ার পেছনে রোকেয়ার নিজের উদ্যোগ ও স্বপ্ন ছিলো শূন্য; রোকেয়া পালন ও পূরণ করেছেন স্বামীর বিধি-নির্দেশ ও পরিকল্পনা। আর বাঙালী মুসলমান নারীদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে রোকেয়ার বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী ছিলো উর্দুভাষী বালিকারা এবং বাঙালী মুসলমান তখনও কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার মত জাগ্রত দশাপ্রাপ্ত হয়নি। ১৯৩২- এ রোকেয়ার মৃত্যুকালে বাঙালী বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিলো মাত্র দু'জন।

রোকেয়া নারীশিক্ষার কাজে ব্রতী হন কারণ সাখাওয়াতই স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ওই প্রভুর মনোযোগের মূলে অবশ্যই ছিলো নিজের শ্রেণীটির স্বার্থরক্ষা ও সুবিধাবৃদ্ধির তাগিদ। সাখাওয়াৎ স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতি হন কারণ তাঁর নিজের জীবনে 'স্বশিক্ষিত' স্ত্রী থাকার নানা ফজিলত তিনি পান। অফিসের ছোটবড় নানা কাজ গৃহে ওই পত্নীপরিচিকাকে দিয়ে সহজেই করিয়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়, এবং এমন পরিচিকা পাবার সুযোগ যাতে তাঁর গোত্রের সকলেই লাভ করে সেজন্যই সাখাওয়াৎ নারী শিক্ষার পক্ষপাতী হন। সাখাওয়াতের মৃত্যুর পরে তাঁকে নিয়ে তাঁর বন্ধুজনেরা যেসব স্মৃতিকথা লেখে, তাতে তন্ন তন্ন করে ফুটে ওঠে ওই প্রভুর অভিসন্ধি ও চাতুর্য :

> সুশিক্ষিতা মিসেস রোকেয়া হোসেন এইরূপ ইংরেজী শিখিয়াছিলেন যে, সাখাওয়াতের কথামত ইংরেজীতে লিখিয়া তাঁহার সরকারি কার্যের অনেকটাই সাহায্য করিতে পারিতেন... । পত্নীর

> সাহায্যে তাহার পারিবারিক জীবন সুখের হইয়াছিল বলিয়া তিনি মুসলমানদের বহুবিবাহ, নাচ, মুজরা প্রভৃতির প্রকৃত প্রতিষেধক ভাবে স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

নিজের সুস্থ অবস্থায় রোকেয়াকে দিয়ে পি.এ-র কাজ করিয়ে আর নানা রকম ফ্যান্টাসী লিখতে উৎসাহ দিয়েই প্রভু তুষ্ট থাকে; রোকেয়াকে তখন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে পাঠিয়ে দেয় না, বা রোকায়াও ওই কাজের জন্য কোন উদ্যোগ নেয় না। রোকেয়া উদ্যোগ নেয়নি, কারণ তাঁর প্রভু উদ্যোগ নেয়নি। যখন দেহে অবধারিত হয়ে ওঠে জড়া ও মৃত্যু, তখনই প্রভু উদ্যোগী হয়ে ওঠে পত্নীকে 'স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের' মহতী কাজে উৎসর্গ করার জন্য। ওই প্রভু আসলে এমনটি করে পরিচিকার ওপরে তাঁর চিরপ্রভুত্ব বজায় রাখার পরিকল্পনা থেকে, এবং রোকেয়াকে ঠেলে দেয় চিরবিকলাঙ্গ, আস্বাভাবিক, অন্তঃসারশূন্য বিধবা 'মহিয়সী'র জীবনযাপন করতে। আর রোকেয়া ওই জীবন অতি আহ্লাদের সঙ্গে যাপন করে চলে। কারণ যে শক্তিবলে দেখা সম্ভব ওই গোপন পীড়ন, লুকানো ষড়যন্ত্র ও শৃঙ্খলকে, সে শক্তি রোকেয়া অর্জন করতেই চাননি। যদিও জাগ্রত চেতনাসম্পন্ন হবার, স্বনির্ভর মানুষ হয়ে ওঠার সকল শক্তি ও সম্ভাবনা তাঁর মধ্যেই ছিলো, প্রবলভাবেই ছিলো; কিন্তু সে দুর্গম কঠিন পথ পরিহার করেছেন রোকেয়া নিজেই। তিনি গেছেন প্রথাগততার ছায়াময় পথে; পুরুষতন্ত্রের 'প্রগতিপন্থী'দের সমর্থন ও আনুকূল্যের মধ্য দিয়ে। তার লড়াই নারীমুক্তির লড়াই নয়। তাঁর লড়াই অতিরক্ষণশীল গোঁড়াদের সঙ্গে; যারা নারীকে নতুনকালে নতুনবিদ্যা সামান্য আয়ত্ব করে 'নতুন আদমের' যোগ্য অর্ধাঙ্গিনী হতেও বাধা দিয়েছিলো, রোকেয়ার প্রতিপক্ষ ছিলো তারা।

সাখাওয়াৎ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে স্ত্রীকে নিয়োজিত করার কথা ভাবেন এ কারণে যে, 'এতে স্বামীর মৃত্যুর পরেও রোকেয়া স্ত্রী-শিক্ষা দানের কাজে আত্মনিয়োগ করে পবিত্র ও শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন।' অর্থাৎ রোকেয়াকে এ পথে ঠেলে দেওয়ার পেছনে আছে শবদেহ শাসিত এবং শবদেহ ধ্যান করে চলার 'পবিত্র ও শান্তিময় জীবন' - এ চিরবন্দি থাকার অভিসন্ধি, অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য নয়। অন্য নানা বাস্তব উদাহরণ থেকেও রোকেয়ার প্রতি তাঁর প্রভুর নৃশংসতার আর হীনতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সাখাওয়াতের সঞ্চয়ের পরিমাণ যৎসামান্য ছিলো না, তা ছিলো উল্লেখযোগ্য অঙ্কের। কিন্তু ওই অর্থ থেকে সামান্য অর্থ তিনি রেখে যান তাঁর বিধবার জন্যে, যার জীবিকা নির্বাহের অন্য কোন উপায় নেই, অবলম্বন নেই, যাঁর কোন আশ্রয় নেই, মাথা গোঁজার ঠাই নেই; তাকেই গৃহহীন করে বিষয় আশয় ও মোটা অংকের টাকা সাখাওয়াৎ বরাদ্দ করে যান প্রথম পক্ষের বিবাহিত কন্যার জন্য :

> মিতব্যয়ী সাখাওয়াতের সত্তর হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি পত্নীর দ্বারা একটি মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্যে দশ হাজার টাকা দিবেন; পত্নীকে দশ হাজার দিবেন এবং বাড়ি এবং অধিকাংশ টাকা কন্যাকে জীবদ্দশায় লিখিয়া দিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ অনেকটা করিয়াছিলেন...।

রোকেয়ার জন্য এবং বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সমান অংকের অর্থ বরাদ্দ হবার কারণ অতি স্পষ্ট। রোকেয়াকে বৈধব্যের কাল কৃচ্ছতায় কাটাবার এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাবার ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্যই প্রভু এমন ব্যবস্থা করে। আর ওই তরুণীকে নিয়ন্ত্রণ করার শৃঙ্খল প্রস্তুতের এককালীন প্রস্তুতির জন্য এমন অর্থ বরাদ্দ করতে প্রভু মুক্তহস্ত ও দরাজ হওয়াই স্বাভবিক। রোয়েয়ার জীবন হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মান্য করার আর মান্য করে নিজেকে ধন্য করার বাস্তবরূপমাত্র। প্রভুর এমন অন্ধত্ব তাঁকে তাই ক্ষুব্ধ করে না। প্রভুকন্যার পীড়নে স্বামীর ভিটা থেকে রেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েও তাই রোকেয়া প্রভুর প্রদর্শিত পথা থেকে একচুল বিচ্যুত হয় না। তার এই মর্ষকামিতা ও স্বেচ্ছাদাসীত্বকে অচিরেই পুরষ্কৃত করা হয়। তার স্তব

রচনা করে পুরুষতন্ত্র এভাবে :

> তাহার অসামান্য এবং পতিব্রতা পত্নী স্বামীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া পবিত্রাত্মা স্বর্গীয় সাখাওয়াতের স্মৃতির পূজা করিতেছেন।

রোকেয়ার স্কুল চালনা প্রকৃত অর্থেই স্বর্গীয় প্রভুর স্মৃতির পূজা ছাড়া আর কিছু নয়। রোকেয়ার মধ্যে স্ববিরোধ বিস্তর। নারী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি নিয়তই দুলেছেন দ্বিধা ও অস্পষ্টতার দোলায়। যদিও এক আধবার মেয়েদের শিক্ষার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে ছেড়ে দেয়ার মতো উত্তেজক কথা তিনি বলে উঠেছেন, কিন্তু তার ভেতরেও অনড় হয়েছিলো পুরুষতান্ত্রিক ওই বিশ্বাস যে নারীর শিক্ষা প্রয়োজন শুধু প্রভুর যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে ওঠার জন্যে। যেমন তিনি নিজে হতে পেরেছিলেন, অন্যরাও যেন তা হয়ে উঠতে সমর্থ হয় - বারংবার রোকেয়া ব্যক্ত করেন সে-কথা। নারী শিক্ষার এমন প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি ব্যক্ত করেন উপন্যাসে, বলেন নানান প্রবন্ধে, স্কুলের বাৎসরিক বৈঠকের বক্তৃতায়ও। সর্বত্র তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেন একই বিশ্বাস। পদ্মরাগ উপন্যাসে ব্যক্ত হয় রোকেয়ার এমন বিশ্বাস ও সঙ্কল্প :

> ছাত্রীদের দুইপাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন।...নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিনী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

নারীর যে ভূমিকা পুরুষতন্ত্র নির্দেশ করেছে রোকেয়া ওই ভুমিকাকে স্বতঃসিদ্ধ বলেই মান্য করেন এবং এই ভূমিকায় সাফল্য অর্জনের জন্যই নারীশিক্ষা অতি জরুরি বলে তার ধ্রুব বিশ্বাস :

> ক. আমি চাই সেই শিক্ষা - যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিনী এবং আদর্শ মাতারূপে গঠিত করিবে।
>
> খ. আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্যে? আমি বলি, সুগৃগিনী হওয়ার নিমিত্তেই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।

নারী তার বিদ্বান পতিপ্রভুর জ্ঞান, বিদ্যা ও উচ্চপদের মহিমা বুঝতে পারছে না বলেও রোকেয়া কাতর হয়ে ওঠেন :

> কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির স্বীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর বোধোদয় পর্যন্ত।

তাই নারীশিক্ষার জন্যে রোকেয়ার সকল উদ্যম, শ্রম, 'জ্বালাময়ী ভাষণ'কে পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিরা যতোই মহিমান্বিত করে তুলুক না কেনো, ওই সকল বাঙালি নারীর প্রকৃত মুক্তির পথে কোনই ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়নি। বরং এসব কিছুও নারীর ভূমিকা বিষয়ক পুরুষতান্ত্রিক অপবিশ্বাস ও প্রচারণা নারীর মনে বদ্ধমূল করে দিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এবং পরে বাঙালি মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রসারও ঘটেছে নারীকে ওই ভূমিকা সুষ্ঠুরূপে আয়ত্ত্ব করার তাগিদে, নারী মুক্তির জন্যে নয়। নারীর বিকাশের কালেই এ-ভাবে তার সুস্থ বিকাশের সকল সম্ভাবনা রুদ্ধ করে তাকে ঠেলে দেওয়া হলো অবধারিত পঙ্গুত্ব ও অস্বাভাবিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠার দিকে। তাই এখন চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্বোচ্চ

ডিগ্রিধারী নারী চিকিৎসকও গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে আগে তাকে সামলাতে হবে সংসার, পরে পেশা। তাই বিকেলে রোগী দেখতে না গিয়ে ননদের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান সামলানোর দায়িত্বপালনেই মন-প্রাণ ঢেলে দেয়, আর তার চেম্বারে এসে বসে থেকে রোগীকূল বিরক্ত হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু কোন পুরুষ চিকিৎসক কখনোই এমনটি করে না, কারণ তার পেশা তার অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যম। এই বোধ তার মনে শক্তপোক্ত করে গেঁথে দিয়েছে পুরুষতন্ত্র। নারীর মনে ঢুলিয়ে দেয়া হয়েছে তার উলটো ধারণা। এ-ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে রোকেয়াও অগ্রণী ভূমিকাই পালন করেছেন ।

[চলবে]